এক বিবর্তনবাদে সংশয়ীর প্রত্যুত্তরে

অভিজিৎ রায়

ফোরামে তর্ক বিতর্ক : এবারে বিষয় ইভোলুশন

ফোরামে তর্ক বিতর্ক করা অনেকদিন ধরেই বন্ধ, বিশেষতঃ ধর্ম নিয়ে। কারণ এ গুলো নিয়ে বিতর্কের কোন শেষ নেই। আর তা ছাড়া ধর্ম নিয়ে বিতর্ক করেও যে খুব লাভ হয় তা নয়; যে যার মত ‘গোঁ ধরে’ বসেই থাকেন- তা তার বিশ্বাসের বিপক্ষে যতই তথ্য প্রমাণ হাজির করা হোক না কেন! এই যে একজন ভদ্রলোক বিভিন্ন ফোরামে পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন প্রমাণ করতে যে আইনস্টাইন থেকে শুরু করে ডারউইন পর্যন্ত সমস্ত মনীষীর (উনার মতে আবার এসমস্ত বিজ্ঞানীরা সবাই ‘হযরত’) আবিস্কার করা সকল জ্ঞানই নাকি শতাব্দী প্রাচীন একটা ধর্ম গ্রন্থে লুকিয়ে আছে। আশ্চর্য্য! যেখানে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থের পদে পদে স্ববিরোধিতা আর হাজারো ভুল তথ্য (আজকের জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে) লক্ষ্যনীয়[*], এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কিছু মানুষ সেই বালির মধ্যেই মাথা গুঁজে রাখতে পছন্দ করে। কার সাধ্য এদের চোখের ঠুলি সরায়! এমনিতেই কাজকর্ম নিয়ে ছিলাম অনেকদিন ধরেই ব্যস্ত। ফোরাম টোরাম গুলোতেও তেমন ভাবে ঢু মারা হয়নি। তাই কোথায় কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাও খুব একটা জানা হয়ে ওঠেনি। এর মধ্যে মুক্তমনার কো-মডারেটর জাহেদ আহমদ সাতরং ওয়েবসাইট থেকে বিবর্তনবাদের উপর রায়হানের লেখা একটি প্রবন্ধের লিঙ্ক পাঠিয়ে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বললেন। সেও তো প্রায় মাস খানেক হতে চলল। প্রবন্ধটা পড়েই এর একটি উত্তর দেব ভেবেছিলাম, এর মধ্যে নানান ঝুট-ঝামেলায় এমনই জড়িয়ে গেলাম উত্তর দিতে সত্যই দেরী হয়ে গেল। আজ অনেকদিন পর হাতে একটু ফুরসত পাওয়ায় পুরোন লিঙ্কটা নিয়ে বসলাম। এর মধ্যে বাংলাদেশের কবিপ্রবর শামসুর রাহমান প্রয়াত হয়ছেন। এই শোকাবহ পরিবেশে বিবর্তনবাদের মত একটি কাঠখোট্টা বিষয়ের উপর তর্ক-বিতর্ক কতটুকু ভাল লাগবে তা পাঠক-পাঠিকারাই নির্ধারণ করবেন।

---

[*] ভ্রান্ত ‘সমতল’ পৃথিবীর ধারণা (দেখুনঃ Q.15:19, 20:53, 43.10, 50: 7, 51:48), ‘অনড়’ পৃথিবীর ধারণা (দেখুন : Q.27:61, 30:25, 35:41, 31:10, 2:22, 16:15), অদৃশ্য ‘শয়তান জ্বীন’ এর উপস্থিতি যাদের কাজ হচ্ছে একজনের ঘারের উপর উপর আরেকজন দাড়িয়ে কানাকানি করে গোপন কথা শুনে ফেলা (Q. 72: 8, 37: 6/10) আর যাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য আল্লাহ উল্কাপাত ঘটান (72: 9, 37:10); এই গ্রন্থেই আছে কিভাবে জুলকার্নাইন এক ‘পঙ্কিল জলাশয়ে’ সূর্যকে ডুবতে দেখে (Q. 18:86), কিংবা বলা আছে স্পার্ম নাকি তৈরী হয় মেরুদন্ড এবং পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে (Q.86:6-7); মাতা মেরী কে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যারনের (মূসার বড় ভাই) বোন হিসেবে (19:28); ইত্যাদি। এগুলো সবই হাস্যকর রকমের ভ্রান্ত তথ্য।

হাস্যকর সংশয়

রায়হানের লেখার যে বৈশিষ্ট্যটি সবার নজর কাড়ে তা হল তার সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গির দাবী। সংশয়বাদ ভাল, খুবই ভাল। সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে ডগম্যাটিক হতে বাধা দেয়। রায়হান নিজেই বলেছেন -'প্রকৃত বিজ্ঞানী বা গবেষকের কাজই হচ্ছে একটি বিষয়ের উপর যথাসম্ভব পজিটিভ এবং নেগেটিভ উভয় দিকই বিবেচনা করে এগিয়ে যাওয়া। প্রকৃত বিজ্ঞানী বা গবেষক কখনও ডগম্যাটিক হতে পারে না।' খুবই সত্যি কথা। চোখ কান খোলা না রেখে এগুলে অহরহই কানা বাবার মত বড়-ছোট নানা গর্তে সেঁদিয়ে যেতে হয় (যদিও দুর্মুখেরা বলেন রায়হান সাহেব নিজেকে 'সংশয়বাদী' মনে করলেও ইদানিংকালে একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থের প্রতি অন্ধ অনুরাগ, পদে পদে সেটিকে ডিফেন্ড করার প্রাণান্তকর চেষ্টা তার কথিত 'ন্যারো গন্ডির মধ্যে আটকে না থাকার' মহান উদ্দেশ্যকে আনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে; যা হোক সেটি আবার অন্য প্রসংগ)।

মূল প্রসঙ্গে আসি। কেউ কোন কিছুতে সন্দেহ, সংশয় প্রকাশ করতেই পারেন। তাতে কেউই আপত্তির কিছু দেখবেন না। বরং উৎসাহই যোগাবেন পুরোমাত্রায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্ব বা তথ্যের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করতে গেলে একটি 'মিনিমাম লেভেলে' হলেও জ্ঞানের ভিত্তিটুকু থাকা চাই। এটি কাঙ্খিত। নইলে সংশয়ী দৃষ্টি থাকার উদ্দেশ্য ব্যাহত তো হয়ই, সেই সাথে নিজেকে হাস্যাস্পদও করে তোলা হয়। যেমন কেউ যদি এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে **পৃথিবী সত্যই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে কিনা** এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন, তবে তা তো হাস্যকরই শোনাবে, তা তার দৃষ্টিভঙ্গি যতই 'মুক্ত' আর 'সংশয়ী' বলে দাবী করা হোক না কেন। রায়হান সাহেব হয়তো এ উদাহরণে রাগ করবেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন এবছর বাংলাদেশে গিয়ে নিউমার্কেটের একটি বইয়ের দোকানে একটি বই দেখলাম, শিরোনাম - 'পৃথিবী নয়, সূর্য ঘোরে।' বইটি প্রকাশ করেছে কলকাতার মল্লিক ব্রাদার্স। লেখকের নাম মুহম্মদ নুরুল ইসলাম। লেখক বলার চেষ্টা করেছেন যে, যেহেতু কোরান (২৭:৬১, ৩০:২৫, ৩৫:৪১ ইত্যাদি) বাইবেল (ক্রনিকলস ১৬:৩০, সাম ৯৩:১, সাম ৯৬:১০ ইত্যাদি), বেদ (ঋক : ১০:৭৩:৪; ১০:১৪৯:১ ইত্যাদি) প্রভৃতি সমস্ত ধর্মগ্রন্থ পরিস্কারভাবে অনড় ও অবিচল পৃথিবীর কথা বার বার নানান জায়গায় পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছে, অতএব আধুনিক বিজ্ঞান যা বলছে বা শেখাছে তা সব মিথ্যা। কোর্পানিকাস, গ্যালিলিও বা ব্রুনোরা সব মিথ্যাবাদী। 'পৃথিবী ঘুরছে' এই নাফরমানি ধারণা আসলে ইহুদী নাসারাদের চক্রান্তের ফল। রায়হান সাহেব হয়তো ভাবছেন কোন এক অজপাড়াগাঁয়ের মোল্লা হয়তো বইটি লিখেছেন, এ নিয়ে এত কথা বলবার কি আছে। আসলে কিন্তু তা নয়; বইয়ের লেখক একজন 'প্রকৌশলী'- আমার কিংবা রায়হান সাহেবের মতই। এখন কথা হচ্ছে এই 'প্রকৌশলী মুহম্মদ নুরুল ইসলাম'-এর সংশয় (পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্বন্ধে) কতটুকু যৌক্তিক ? আমার ধারণা সবাই একবাক্যে হয়তো বলবেন 'হাস্যকর'। কারণ স্কুলের প্রাইমারী লেভেলের বিজ্ঞানের বইগুলোতে যে পৃথিবী ঘূর্ণনের সপক্ষে যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলোই তিনি

ঠিকমত আত্মস্থ করতে পারেননি। ফলে তিনি পরীক্ষা পাশ করে 'প্রকৌশলী' হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তার জ্ঞান সেই 'মিনিমাম লেভেল' এ পৌঁছয়নি, মাথা রয়ে গেছে সেই আদিম গুহাশ্রয়ী মানুষের স্তরেই। শুধু নুরুল ইসলাম নয়; এধরনের উধাহরণ দেওয়া যায় আরো। ব্রিটেনে একদল তথাকথিত 'সংশয়বাদী' লোক পৃথিবী যে গোল এই ধারণায় সংশয় প্রকাশ করে গঠন করেছেন একটি সমিতি, নাম - 'ইন্টারন্যাশনাল ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি'। তাদের এখনো দৃঢ় ধারণা পৃথিবী আসলে বাইবেলের ধারণা অনুযায়ী সমতল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের 'হাস্যকর' সংশয়ের আদৌ কোন তাৎপর্য আছে আমাদের কাছে?

আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি বিবর্তন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে রায়হান যে লেখাটি লিখেছেন তা ওই প্রকৌশলী নুরুল ইসলাম কিংবা ফ্ল্যাট আর্থারদের মত 'হাস্যকর ধরনের সংশয়বাদী' লেখা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি বিবর্তনবিদ্যার উপর কোন টেক্সটবুক পড়েননি। মার্ক রিডলী (ব্ল্যাকয়েল পাবলিশিং, ২০০৪) কিংবা ডগলাস ফুতুয়ামার (সিনোয়ার এসোসিয়েটস, ২০০৫) লেখা 'ইভ্যলুশন' কিংবা আর্নেস্ট মায়ারের 'হোয়াট ইজ ইভ্যলুশন' (বেসিক বুকস্, ২০০১) যদি ঠিকমত পড়তেন তাহলেই তার তথাকথিত 'সংশয়বাদী' লেখার উত্তর পেয়ে যেতেন। বাংলাভাষায়ও বিবর্তনের উপর চমৎকার একটি টেক্সটবুক আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ম আখতারুজ্জামানের লেখা 'বিবর্তন বিদ্যা' (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)। এ বইটি ১৪০৫ বঙ্গাব্দে বাংলাদেশে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বিবেচিত হওয়ায় জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। 'নিরস' পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও বিবর্তনের বিভিন্ন ধারণাকে সমন্বিত করে অনেক জনপ্রিয় ধারার বই পত্তর লেখা হয়েছে। যেমন রিচার্ড ডকিন্সের 'ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার' বা 'অ্যান্সেসটরস টেল'। এ ছাড়া টিম বেড়া, ইউজিন স্কট, স্টিফেন জে গুল্ডেরও চমৎকার সব বই এবং প্রবন্ধ আছে। আমি আশা করব বিবর্তনবাদের মত বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় 'এক ফুঁ মেরে' উড়িয়ে দেবার চেস্টা করার আগে বইগুলো একটু কস্ট করে পড়ে নেবেন। তা না করে ইন্টারনেটে ধর্মোন্মাদীদের ওয়েবসাইট থেকে এটা ওটা ভুল-ভাল চটকদার 'তথ্য' সংগ্রহ করে যদি বিবর্তনকে ঠেকাতে চান, তবে ওই 'প্রকৌশলী নুরুল ইসলাম'দের মত হাস্যাস্পদই হবেন।

বিবর্তনের সাক্ষ্য: আধুনিক তথ্যের ভিত্তিতে

বিবর্তন সম্বন্ধে রায়হান সাহেবের অজ্ঞতার বড় প্রমাণ তার নিম্নোক্ত উক্তি গুলো :

> 'ইভলুশন ফর্মূলা = লাইক আলাদীনস ল্যাম্প ?? ওর লাইক এ গ্রান্ডমা স্টোরি'।
>
> 'ম্যাক্রোইভলুশন কোনভাবেই বিজ্ঞানের মধ্যে পড়ে না! কিছু কিছু বিজ্ঞানী সম্ভবত ধর্মের বিরোধিতা করতে গিয়ে ম্যাক্রো-ইভলুশনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই জোর করে বিজ্ঞানের মধ্যে গুঁজিয়ে দেবার চেস্টা করছে।'

কিংবা

> ‘তুচ্ছ কিছু ফসিল (যেমন মিলিয়ন বছর আগের একটি দাঁত, সামান্য হাড়ের টুকরো ইত্যাদি) থেকে মহা কনক্লুশন ড্র করেছেন তা অন্ধ মোল্লাদেরও হার মানাবে’। ইত্যাদি।

রায়হান সাহেবের এসমস্ত আপ্তবাক্যের কি জবাব দেব বুঝতে পারছি না। বিজ্ঞানী পাউলি এধরনের তত্ত্ব দেখে বলতেন, ‘These theories are so bad that they are not even wrong’। রায়হানের লেখা দেখে আমারও পাউলির মতই বলতে ইচ্ছা করছে যে, তার তত্ত্ব এতোই নিকৃষ্ট যে তা সমালোচনারও যোগ্য নয়! রায়হান সাহেবকে কে বোঝাবে যে, ‘কিছু কিছু বিজ্ঞানী সম্ভবতঃ ধর্মের বিরোধিতা করতে গিয়ে’ বিবর্তনকে বিজ্ঞানের মধ্যে জোর করে ‘গুঁজিয়ে’ দিচ্ছেন না, বরং উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েই তারা বিবর্তনবাদী হয়েছেন। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে জীববিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই ছিলেন সৃষ্টিতাত্ত্বিক (এমনকি ডারউইন নিজেও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন ধর্মতত্ত্ব শিখে ধর্মযাজক হওয়ার জন্য)। তখন কেউ প্রাণ কিভাবে সৃষ্টি হল, কিংবা প্রজাতি কিভাবে সৃষ্টি হল এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য খুঁজতেন, বিশ্বাস করতেন ধর্মগ্রন্থে বলা ‘ছয় দিনে বিশ্ব তৈরীর কাহিনীতে’ কিংবা নূহ নবীর আমলে ঘটা মহাপ্লাবনের কেচ্ছা কাহিনীতে, সে সমস্ত সৃষ্টিতাত্ত্বিকরাই ঈশ্বর কিভাবে এগুলো বানিয়েছেন তা খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কেচ্ছা কাহিনী গুলোর সাথে বাস্তবতার মিল পাওয়া যাচ্ছে না। তারা নিজেরাই বুঝলেন যে পৃথিবীর বয়স বাইবেলে বর্ণিত ছয় হাজার বছরের চেয়ে ঢের বেশী; নূহের প্লাবনের সাথে মাটি খুঁড়ে পাওয়া ফসিল রেকর্ড গুলো মিলছে না। শুধু তাই না পাওয়া যাচ্ছে কিম্ভুতকিমাকার বিলুপ্ত প্রজাতির হাড়-গোড় আর আর জীবাশ্ম। এমনকি পাওয়া যাচ্ছে ‘মিসিং লিঙ্ক’ হিসেবে পরিচিত দুই ট্যাক্সার (বহুবচনে taxa, একবচনে taxon) বৈশিষ্ট্যযুক্ত নানা ফসিল। ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্বের এবং পরবর্তীতে সাইটোজেনেটিক্স এবং আনবিক জীববিজ্ঞানের আবির্ভাবের পর সবকিছুই তাদের কাছে পানির মত পরিস্কার হয়ে গেল। রায়হানের কথামত ‘ধর্মের বিরোধিতা’ করবার জন্য ‘কিছু’ বিজ্ঞানী বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে মেতেছেন তা মোটেও সত্যি নয়, বরং ‘অন্ধ ধার্মিকরাই’ আজ নিজেদের অন্ধবিশ্বাসের বশে বিবর্তনকে অস্বীকার করে চলেছেন। বলা বাহুল্য যে, আজকের দিনে জীববিজ্ঞানীদের সকলেই বিবর্তনবাদী। কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালেই বিবর্তনকে অস্বীকার বা বিরোধিতা করা হয় না; সেখানে হয়তো বিবর্তন কিভাবে ঘটছে তার পদ্ধতি নিয়ে (যেমন ধীর গতিতে ঘটছে নাকি উল্লফন ঘটছে) মতানৈক্য হতে পারে, বিতর্ক হতে পারে বিবর্তনের পদ্ধতি কি ফাইলেটিক (phyletic), স্যালটেশন (saltation) নাকি কোয়ান্টাম (quantum) এ নিয়ে; কিন্তু বিবর্তন যে ঘটছেই সে ব্যাপারে জীববিজ্ঞানী এবং প্রাণরসায়নবিদদের মধ্যে এখন কোনোই সংশয় নেই। আর সেজন্যই বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং আধুনিক বিবর্তনবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা থিওডসিয়াস ডাবঝানস্কি (Theodosius Dobzhasky) বলেছেন

যে, ‘Nothing in Biology makes any sense except in the light of evolution’। মানে, বিবর্তনের আলোকে না দেখতে পারলে জীববিজ্ঞানের কোন কিছুরই অর্থ হয় না। এ কথা খুবই সত্যি। বস্তুতঃ বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণ আজ এতোই বেশী যে সেগুলোকে অস্বীকার করার অর্থ অনেকটা পৃথিবীর গোলত্বকে অস্বীকার করার মতই। বিবর্তন বা জৈব অভিব্যক্তির পক্ষে যে সমস্ত সাক্ষ্য হাজির করা যায় তা হল : প্রাণ রাসায়নিক প্রমাণ, কোষবিদ্যা বিষয়ক প্রমাণ, শরীরবৃত্তীয় প্রমাণ, সংযোগকারী জীবের (connecting link) প্রমাণ, ভৌগলিক বিস্তারের (Geographical distribution) প্রমাণ, তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানের প্রমাণ, শ্রেনীকরণ সংক্রান্ত প্রমাণ, নিষ্ক্রিয় বা বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গের প্রমাণ ইত্যাদি। আর ফসিলের সাক্ষ্য তো আছেই।

তবে ১৯৫০ সালের পর থেকে বিবর্তনের সপক্ষে সবচেয়ে জোরালো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গেছে ‘আনবিক জীববিদ্যা’ (molecular biology) এবং সাইটোজেনেটিক্স (cytogenetics) থেকে। ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক ডিএনএ’র আনবিক গঠন উদ্‌ঘাটন করেন। তারা ডিএনএ অনুর যে মডেল প্রস্তাব করেন তা ‘ওয়াটসন-ক্রিক’ যুগল-সর্পিল মডেল নামে পরিচিত। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালে দুই বিলিয়ন ডলার বাজেট নিয়ে ২০ বছর ব্যাপী মানব-জিনোম প্রকল্প শুরু হয়, যা মাত্র ক’দিন আগে ২০০৪ সালে শেষ হয়েছে। ভবিষ্যতে জিনের মধ্যে খুঁজলেই পাওয়া যাবে আমাদের বিবর্তনের ইতিহাস। ইতিমধ্যেই দেখা গেছে আমাদের ডিএনএ শিম্পাঞ্জীর ডিএনএ’র সাথে প্রায় ৯৮.৬%, ওরাং ওটাং-এর সাথে ৯৭% এবং ইদুরের সাথে ৮৫% মিলে যাচ্ছে। এর উত্তর কি? উত্তর খুব সোজা। বিবর্তন তত্ত্ব বলছে প্রজাতিগুলো যত কাছাকাছি সম্পর্কিত, তাদের জেনেটিক গঠনও থাকবে কাছাকাছি। শিম্পাঞ্জীকূলের সাথে আমাদের জেনেটিক গঠণে এতো মিল কারণ, আমরা ৫০-৮০ লক্ষ বছর আগে এক ধরনের শিম্পাঞ্জী থেকে বিবর্তিত হয়েছি। সে তুলনায় ইদুরের ডিএনএ’র সাথে আমাদের ডিএনএ’র মিল কম কারণ সেই প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্নকরণ ঘটেছিল শিম্পাঞ্জী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনেক আগে। রায়হান সাহেব কি এগুলোর খবর জানেন না?

শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জীবের বংশানুসৃত দ্রব্য ডিএনএ এবং আরএনএ এবং প্রোটিনের অনুগুলোর আনবিক গঠণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তাদের আনবিক গঠণ ও একই রকমের। যেমন প্রকৃতিতে ৩২০ রকমের এমাইনো এসিড পাওয়া গেলেও দেখা গেছে প্রতিটি জীব গঠিত হয়েছে মাত্র ২২টি এমাইনো এসিডের রকমফেরে। অর্থাৎ একই রকমের (২২টি) এমাইনো এসিড দিয়ে সকল জীবের প্রোটিন গঠিত। প্রোটিন অনুতে এমাইনো এসিডের আবশেষগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকে বলে এমাইনো এসিড অনুক্রম। ঠিক একই রকমভাবে দেখা গেছে যে, সকল জীবের ডিএনএ অনুর গঠন একক বেসও একই ধরনের। মাত্র চার প্রকার বেস (এডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন) দিয়ে সকল জীবের

ডিএনএ গঠিত। প্রতি বছরই প্রকৃতিতে প্রায় হাজার খানেক করে নতুন প্রজাতির সন্দান পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। প্রতিদিনই নতুন নতুন ডিএনএ এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ করছেন তারা ল্যাবরেটরীতে বসে। একটি ক্ষেত্রেও তারা ব্যতিক্রম পাননি। জীব জগতের প্রজাতি যদি কোন 'অতিপ্রাকৃত মহাপরাক্রমশালী' স্রষ্টার হাতের কারসাজিতে সৃষ্ট হতো, তবে ইচ্ছে করলেই তিনি অজানা অচেনা জেনেটিক পদার্থ দিয়ে কোন প্রজাতি বা জীব তৈরী করতে পারতেন। সেরকম কোন জীবই এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আসলে সকল জীবের উৎপত্তি যদি একই উৎস থেকে বিবর্তিত না হয়ে থাকে তবে আধুনিক জীববিদ্যার এ সমস্ত তথ্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই যে, জীবের উৎপত্তি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় - তা সে 'আশরাফুল মাখলুকাৎ' মানুষই হোক অথবা বিশাল বপু হিপোপটেমাসই হোক - সকলেই একই উৎসের ধারাবাহিক বিবর্তনের ফসল।

শুধু তাই নয় - আনবিক জীববিদ্যা খুব ভাল ভাবে দেখিয়েছে যে প্রোটিনে এমাইনো এসিডের অনুক্রমে পরিবর্তনের কারণ ডিএনএ জেনেটিক কোডে মিউটেশন। মিউটেশনের হারও নানাভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন প্রোটিনের এমাইনো এসিড অনুক্রম ও নিউক্লিয়িক এসিডে পলিনিউক্লিয়িড অনুক্রম বিশ্লেষণ করে যথাক্রমে এমাইনো এসিড আর বেসের প্রতিস্থাপন হিসেব করে মিউটেশনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। দেখা গেছে সমগ্র জীব জগতে গড়ে ১৭.৬ মিলিয়ন বছরে একটি এমাইনো এসিড প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে হিসেব করলে দেখা যায় প্রাণী ও উদ্ভিদ একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ৭৯২ মিলিয়ন বছর আগে। এ হিসেবটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের হিসেবের সাথে অবিকল মিলে যায়। সরিসৃপ এবং স্তন্যপায়ীদের 'সাইটোক্রোম সি' অনুর মধ্যে এমাইনো এসিডের গড় পার্থক্য থেকে হিসেব করে বের করা হয়েছে যে এ দুটি গ্রুপের পৃথক হতে সময় লেগেছে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বছর। ঠিক একই ভাবে শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং ও মানুষ বিবর্তনের ধারায় কখন একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে তাও খুব নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

কোষবংশগতিবিদ্যা (Cytogenetics) এবং আনবিক জীববিদ্যা (molecular biology) বর্তমানে বিবর্তনের সপক্ষে এক অফুরন্ত তথ্য ভান্ডার। শুধু এগুলোর সাহায্যেই প্রমাণ করা যায় যে প্রকৃতিতে বিবর্তন ঘটেছে এবং সেই সাথে নির্ভরযোগ্যভাবে রচনা করা যায় পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে ফসিলগুলো যদি নাও পাওয়া যেত, তবু শুধু জেনেটিক তথ্য বিশ্লেষণ করেই বিবর্তনকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব - এটি এখন নির্দ্বিধায় বলা যায়। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স তাই তাঁর 'The Ancestor's Tale' বইয়ে বলেছেন (পৃঃ ১৩) :

> 'In spite of the fascination of fossils, it is surprising how much we would still know about our evolutionary past without them. If every fossil were magicked away, the

comparative study of modern organisms, of how their patterns of resemblances, especially of their genetic sequences, are distributed among species, and of how species are distributed among continents and islands, would still demonstrate, beyond all sane doubt, that our history is evolutionary, and that all living creatures are cousins. Fossils are a bonus. A welcome bonus, to be sure, but not an essential one.'

রায়হান সাহেব বিবর্তনকে 'ধোলাই দিতে' এতো কিছু লিখলেন কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞান, বংশগতিবিদ্যা আর আনবিক জীববিদ্যা নিয়ে একটি লাইনও লিখলেন না, কেন ?? এটি কি তার অজ্ঞতা নাকি 'উদ্দেশ্যমূলক নির্লিপ্ততা'? যে ম্যাক্রো-ইভোলুশনের উদাহরণ পাওয়ার জন্য তিনি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল খুঁজে ফিরছেন, তার প্যাটার্ন তো লুকিয়ে ছিলো তার মুঠোর মধ্যেই। নাকি দেখেও সচেতনভাবে না দেখার ভান করেছেন?

ম্যাক্রোবিবর্তনের পক্ষে খুব জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে রক্তরস বিজ্ঞান থেকেও। রক্তকে জমাটবদ্ধ হতে দিলে যে তরল পদার্থ পৃথক হয়ে আসে তার নাম সিরাম (serum)। এতে থাকে এন্টিজেন। এ সিরাম এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে প্রবেশ করালে উৎপন্ন হয় এন্টিবডি (antibodies)। যেমন মানুষের সিরাম খরগোশের দেহে প্রবেশ করালে উৎপন্ন হয় এন্টি হিউম্যান সিরাম। এতে থাকে এন্টি হিউম্যান এন্টিজেন। এ এন্টিহিউম্যান সিরাম অন্য মানুষের সিরামের সাথে মেশালে এন্টিজেন এবং এন্টিবডি বিক্রিয়া করে অধঃক্ষেপ বা তলানি উৎপন্ন হয়। এই এন্টিজেন-এন্টিবডি বিক্রিয়া করে অধঃক্ষেপ বা তলানি উৎপন্ন হয়। এই অ্যান্টি হিউম্যান সিরাম নরবানর, 'পুরোন পৃথিবীর' বানর, লেমুর প্রভৃতির সিরামের সাথে বিক্রিয়া করালে দেখা যাবে, যে প্রাণীগুলোর সাথে মানুষের সম্পর্কের নৈকট্য যত বেশি তলানির পরিমান তত বেশি হয়। পুর্বোক্ত প্রাণীগুলোর মধ্যে বিক্রিয়ার অনুক্রম হল :

মানুষ –> নরবানর –> পুরোন পৃথিবীর বানর –> লেমুর

অঙ্গসংস্থানবিদদের মতে উল্লিখিত প্রাণীদের মধ্যে সর্বাধিক আদিম হচ্ছে লেমুর, আর সবচেয়ে নতুন প্রজাতি হচ্ছে মানুষ। তাই মানুষের ক্ষেত্রে তলানির পরিমাণ পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি আর লেমুরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম। দেখা যাচ্ছে বিবর্তন যে অনুক্রমে ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়েছে রক্তরস বিজ্ঞানের 'অ্যান্টিজেন এন্টিবডি' বিক্রিয়াও সে ধারাবাহিকতাকেই সমর্থন করে।

লুপ্ত এবং নিষ্ক্রিয় অঙ্গাদি: বিবর্তন-বিরোধীদের জবাব কি?

বিবর্তনের পক্ষে এরকম গন্ডা গন্ডা প্রমাণ হাজির করা যায়। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল মানবদেহে থেকে যাওয়া বিলুপ্ত প্রায় অংগের প্রমাণ। যেমন, আমাদের পরিপাকতন্ত্রের অ্যাপেন্ডিক্স কিংবা পুরুষের স্তনবৃন্ত। এগুলো তো দেহের কোনই কাজে লাগে না, বরং বর্তমানে অ্যাপেন্ডেসাইটিস রোগের বড় উৎসই হল এই অ্যাপেন্ডিক্স। তা হলে এগুলো দেহে থাকার কি ব্যাখ্যা? একজন 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনারের' সৃষ্টি এত 'আনইন্টেলিজেন্ট' হবে কেন যে ত্রুটিগুলো ছা-পোষা সাধারণ মানুষেরও চোখে পড়বে? শুধু তো অ্যাপেন্ডিক্স নয়, আমাদের দেহে রয়ে গিয়েছে চোখের নিক্টিটেটিং ঝিল্লি, কান নাড়াবার কিছু পেশী, ছেদক, পেষক এবং আক্কেল দাঁত, মেরুদন্ডের একদম নীচে থেকে যাওয়া লেজের হাড়, সিকাম সহ শতাধিক নিষ্ক্রিয়, অবান্তর এবং বিলুপ্ত অঙ্গাদি। কোন মহান 'সৃষ্টি তত্ত্ব' কিংবা 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' দিয়ে এগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না। এ মুহূর্তে এগুলোকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কেবল বিবর্তন তত্ত্ব। দেখা গেছে, এপেন্ডিক্স এবং সিকাম মানুষের কাজে না লাগলেও তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হজম করার জন্য অত্যাবশকীয় অংগ। প্রাচীন নরবানর যেমন Australopithecus robustus তৃণ সহ সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করত। এখনো শিম্পাঞ্জীরা মাংশাসী নয়। কিন্তু মানুষ খাদ্যাভাস বদল করে লতা পাতার পাশাপাশি একসময় মাংশাসী হয়ে পড়ায় দেহস্থিত এই অংগটি ধীরে ধীরে একসময় অকেজো এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই এখন অ্যাপেন্ডিক্স এবং সিকাম আমাদের কাজে না লাগলেও রেখে দিয়ে গেছে আমার এ প্রবন্ধের জন্য অতি প্রয়োজনীয় 'বিবর্তনের সাক্ষ্য'। ঠিক একই ভাবে তিমির বিলুপ্তপ্রায় অংগ হচ্ছে *পেছনের পায়ের হাড়্গুলো* যেগুলো খুব পরিস্কার ভাবে সাক্ষ্য দেয় যে এরা একসময় *আর্টিওডাক্টিলা* (হিপোপটেমাসের মত এক ধরনের স্থলচরী স্তন্যপায়ী প্রাণী) হতে বিবর্তিত হয়েছে। রায়হান সাহেব এগুলো অস্বীকার করবেন কি করে?

অবজারভেবল ফেনোমেনন : বিজ্ঞান কি বলে?

এক সময় গোঁড়া ধর্মবাদী লোকজন পুরো বিবর্তনকেই অস্বীকার করতো। এখন হাজারো সাক্ষ্য-প্রমাণ আর যুক্তির চাপে অন্ততঃ স্বীকার করছেন যে, হ্যা মাইক্রো-ইভলুশন ঘটে বটে। রায়হান নিজেও বলেছেন, 'মাইক্রো ইভোলুশন বা মাইনর ভ্যারিয়েশন যেটাই বলা হোক না কেন বিষয়টি যে সত্য এবং একটি অবজারভেবল ফেনোমেনন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর অবজারভেবল ফেনোমেনন হওয়াতে বিষয়টি বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত হতেই পারে।' যাক

বাবা, তাও বাঁচা গেল। যেহেতু রায়হান মাইক্রো ইভলুশন বলে কিছু একটা ঘটে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, কাজেই আমি অযথা মাইক্রো-ইভলুশনের উদাহরণ হাজির করে লেখার কলেবর বাড়াচ্ছি না। উনার মতে যত সমস্যা ম্যাক্রো-ইভলুশন নিয়ে। ম্যাক্রো ইভলুশন তিনি স্বীকার করেন না; তার মতে, 'ম্যাক্রো ইভলুশন পুরোপুরি বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে', কারণ এটি কোন 'অবজারভেবল ফেনোমেনন' নয়! এর জবাবে বল যায়, রায়হান সাহেব তাহলে বিজ্ঞানের সংজ্ঞাই জানেন না। পদার্থবিজ্ঞানের অনেক কিছুই কিন্তু অবজারভেবল ফেনমেনন নয়। যেমন পরমানুর অস্তিত্ব বিজ্ঞান প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করেছিলো কোন 'অবজারভেবল ফেনোমেনন' এর ভিত্তিতে নয়, বরং পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে (কিছু রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রনের অনুপাত থেকে, আর পরবর্তীতে ব্রাউনীয় ইতস্ততঃ গতি অধ্যয়ন করে)। কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বও বিজ্ঞান কোন সরাসরি 'অবজারভেবল ফেনোমেন' এর ভিত্তিতে স্বীকার করেনি, বরং মেনে নিয়েছিল গানিতিক প্রমাণ পেয়ে এবং পরে পরোক্ষ প্রমাণে। আর তা ছাড়া ব্ল্যাক হোলকে 'অবজারভ' করতে পারতে হবে তো! যে বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ থেকে আলো পর্যন্ত পালাতে পারে না, তাকে 'অবজারভ' করাটা হবে কি করে শুনি! আজকের পদার্থবিজ্ঞানের জগতে স্ট্রীং তত্ত্ব, মাল্টিভার্স, হিগস্ ফিল্ড, ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি - এগুলো কোনটিই রায়হান কথিত 'অবজারভেবল' ফেনোমেনন নয়। কিন্তু পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানহীন অকাট মূর্খরাই এগুলোকে 'বিজ্ঞান বিরোধী' কিংবা 'বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়' বলে ভাববেন। বস্তুতঃ অবজারভেবল নয় বিগব্যাং-এর ধারণাও। কেউ চোখের সামনে বিগ ব্যাং ঘটতে দেখেনি, কিংবা ল্যাবরেটরীতেও কেউ বিগ ব্যাং ঘটিয়ে দেখাননি। তাহলে বিগ ব্যাং বিজ্ঞানের অংশ হচ্ছে কি করে? অংশ হচ্ছে কারণ পদার্থবিজ্ঞানীরা রায়হান সাহেবের মত 'অবজারভেবল ফেনোমেনন' এর আশায় বসে থাকেন না। তারা সিদ্ধান্ত নেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ *পরোক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের* ভিত্তিতেও। এমনি একটি বড় সাক্ষ্য ছিল ১৯৬৪ সালে কসমিক ব্যকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের খোঁজ পাওয়া যা স্থিতি তত্ত্ব (steady state theory) সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক তত্ত্বকে হটিয়ে বিগ ব্যাং কে বিজ্ঞানের জগতে স্থায়ী আসন করে দেয়। তো কসমিক ব্যকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন যদি বিগ ব্যাং এর মত বড় ঘটনাকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আর রায়হান সাহেবের মত 'সংশয়বাদী'রা যদি সেগুলো মেনেও নিতে পারেন, তবে গন্ডা গন্ডা ফসিল রেকর্ড আর প্রাণ রসায়ন, কোষ বংশগতিবিদ্যা, আনবিক জীবদিদ্যা, শরীর বিদ্যা, বাস্তুসংস্থানবিদ্যা, তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানবিদ্যা, প্রত্নজীববিদ্যা প্রভৃতির অফুরন্ত তথ্য আর সাক্ষ্যের আলোকে বিবর্তনের পক্ষে যে উপসংহার টানা হয়েছে তা মানতে তার এতো আপত্তি কেন? এই মুহূর্তে বিবর্তন তত্ত্ব (Theory of evolution) ছাড়া আর অন্য কোন তত্ত্ব তো পৃথিবীতে প্রজাতির উদ্ভব আর জীবনের এই নান্দনিক বিকাশকে ব্যাখ্যা করতে পারছে না।

ম্যাক্রো-ইভলুশন কি সত্যই অবজারভেবল ফেনোমেনন নয়?

রায়হান সাহেব নিশ্চয় এতোক্ষণে খুশিতে বগল বাজাতে শুরু করেছেন এই ভেবে তিনি ম্যাক্রো ইভলুশন 'অবজারভেবল ফেনোমেনন' নয় বলছেন, সেটিকে আমি স্বীকার করে নিয়েছি। আসলে তা নয়। উপরে 'অবজারভেবল ফেনোমেনন' নিয়ে এত কিছু লিখেছি পাঠকদের জানাতে যে বিজ্ঞান রায়হান-কথিত 'অবজারভেবল ফেনোমেনন' এর বাইরেও অসংখ্য পরোক্ষ প্রমাণ নিয়ে কাজ করে, প্রায়শঃই তার ভিত্তিতে শক্তিশালী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বিজ্ঞান যদি যদি রায়হান সাহেবের মত কেবল চাক্ষুষ প্রমাণ আর 'অবজারভেবল ফেনোমেনন' এ মুখ গুঁজে পড়ে থাকত তবে আজও আমরা পৃথিবীকে সমতল ভাবতাম, আর আজও আমাদের মানসপটে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরত!

তার মানে অবশ্যই এই নয় যে ম্যাক্রো-বিবর্তন দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা বহু ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ফসিলের সাহায্যে পরোক্ষ প্রমাণ হাজির করলেও অনেক ক্ষেত্রেই চাক্ষুষ প্রমাণও পেয়েছেন। রায়হান কি **পলিপ্লয়ড**, **এলোপলিপ্লয়ড** এগুলোর কথা শুনেছেন? উদ্ভিদে কোয়ান্টাম প্রজাতি তৈরী হয় পলিপ্লয়ড এবং এলোপলিপ্লয়ডের মাধ্যমে। **১৯১০-১৯৩০** এর মধ্যে আমেরিকার ওয়াশিংটন এবং আইডাহো স্টেটে স্যালসিফাই গাছের তিনটি প্রজাতির (Tragapogon dubius, Tragapogon pratensis, Tragapogon porrifolius) থেকে দুই ধরনের নতুন প্রজাতি জন্ম নিয়েছিলো বিজ্ঞানীদের চোখের সামনেই! এরা ভিন্ন প্রজাতি বলে স্বীকার করা হল কারণ, দেখা গেল এদের মধ্যস্থিত ক্রোমজম সংখ্যাই গেছে বদলে। ফলে প্রথমোক্ত প্রজাতিগুলোর সাথে তারা প্রজননে ছিল অক্ষম (ঠিক যেমনি হাতি এবং উট কিংবা শিমপাঞ্জী এবং মানুষ পরস্পরের মধ্যে প্রজননে অক্ষম)। তাহলে এই নতুন দু'ধরণের প্রজাতি এলো কোথা থেকে? এরা আসলে প্রাকৃতিকভাবেই প্রথম তিনটি প্রজাতি থেকে পলিপ্লয়ড সংকরায়নের (poliploid hybridization) ফলে সৃষ্ট হয়েছে। তার মানে মিউটেশনের ফলে প্রাকৃতিকভাবেই জন্ম নিয়েছে দুটি ভিন্ন প্রজাতি। একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন লন্ডনের বিজ্ঞানীরাও। তারা বিখ্যাত কিউ গার্ডেনে (Kew Garden) নতুন একটি প্রজাতি Primula Kewensis উদ্ভব হওয়ার প্রক্রিয়াটি চোখের সামনেই ঘটতে দেখেন। পাশাপাশি আবাদ করা দুটি ভিন্ন প্রজাতি থেকে পলিপ্লয়ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রজাতি প্রাকৃতিকভাবেই তৈরী হয়, যা ওই গার্ডেনে তো বটেই, পৃথিবীর আর কোথাওই নেই। কিউতে উৎপন্ন হয়েছে বলে এর নাম রাখা হয়েছে Kewensis । এধরনের উদাহরণ আছে বহু। বিজ্ঞানীরা এও বের করেছেন যে, আমাদের চেনা জানা বেশ কিছু আবাদী ফসল (যেমন আপেল, কলা, কফি, তুলা, বাদাম, প্লাম, গোল আলু, স্ট্রবেরি, আঁখ, তামাক, গম ইত্যাদি) পলিপ্লয়ড। আসলে সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রায় ৪৭% ই হচ্ছে পলিপ্লয়ড। কাজেই বিবর্তনের মাধ্যমে প্রজাতি সৃষ্টিতে পলিপ্লয়ডের ভূমিকা প্রমানিত এবং স্পষ্ট।

শুধু প্রাকৃতিকভাবে নয়, কৃত্রিমভাবেও ল্যাবরেটরীতে পলিপ্লয়িডি তৈরী করা গেছে। আমাদের দেশ সহ অনেকদেশেই বাতের চিকিৎসায় প্রাচীন বার্জেন্টাইন কাল থেকে Liliaceae গোত্রের আগাছা এর বীজ এবং কন্দের রস কলচিসিন (colchicine) ব্যবহৃত হত। এটিকে ব্যবহার করে ১৯৩৭ সালে ব্লেক্সলি (Blakeslee) এবং পরবর্তীতে নেবেল (Nebel) উদ্ভিদে পলিপ্লয়ড তৈরী করেন। এটি নিসন্দেহে কৃত্রিমভাবে পলিপ্লয়ড উৎপাদনে অর্থাৎ চোখের সামনে বিবর্তনকে দেখার আর বোঝার প্রচেষ্টায় এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর মাধ্যমে ক্রোমজোম না ভেঙে বা এদের কোন ক্ষতি না করে এমনকি মিউটেশনও না ঘটিয়ে শুধু ক্রোমজোম সংখ্যাকে দ্বিগুন করে দেওয়া গেল।

এবারে এলোপলিপ্লয়ডে আসি। অনুর্বর সংকর জীবে উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে **উইঙ্গে-ডিগিবি প্রকল্প** অনুযায়ী এলোপলিপ্লয়ড প্রপঞ্চ ব্যবহৃত হয়; ফলে একটি জীবে দুই বা ততোধিক জিনোম বিদ্যমান থাকে। রাশিয়ার উদ্ভিদ প্রজননবিদরা এ পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম বাঁধাকপি আর মূলার সমন্বয়ে একটি নতুন উর্বর প্রজাতি পেয়েছিলেন ১৯২৮ সালে। এ প্রজাতিটির পাতা ছিল মূলার মত, আর শিকর বাঁধাকপির মত। এর নাম দেওয়া হয় Raphano-brassica। এটি বাঁধাকপি এবং মূলা উভয় থেকেই ভিন্নতর। শুধু তাই নয়, এ প্রজাতিটি পৃথিবীর আর কোথাওই নেই। এটি মানুষের হাতে সচেতনভাবে তৈরী একটি নতুন প্রজাতি। যেখানে ডারউইনীয় পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি তৈরীতে বিপুল সময় লাগে (মিলিয়ন স্কেলে), সেখানে কৃত্রিমভাবে ল্যাবরেটরীতে মাত্র কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি গঠনের একটি সফল পরীক্ষা মঞ্চস্থ করলেন রাশিয়ার বিবর্তনবাদীরা (রেফারেন্সঃ এলোপলিপ্লয়ড, কোষবংশগতিবিদ্যা, ষোড়শ অধ্যায়, পৃঃ ২৬০)। তারপরও রায়হান সাহেব বলবেন যে ম্যাক্রো-বিবর্তন হয় না?

এবার আমরা দেখি প্রাণী জগতে প্রজাতি গঠনের কোন চাক্ষুষ উদাহরণ আছে কিনা।

ম্যাক্রোবিবর্তন ও প্রজাতির উদ্ভব : প্রাণী জগতে

রায়হান লিখেছেন : 'কুকুর থেকে কেহ ছাগল/ভেড়া হয়ে যাচ্ছে না'; কিংবা 'ফিঞ্চ পাখিগুলো পরবর্তীতে কুকুর/বিড়াল/মানুষ হয়েছিল কিনা তার কোন প্রমাণ নেই'। এ ধরনের 'চটকদার' কথার উত্তর দিতে হলে আমাদের পরিস্কার করে বোঝা দরকার বিবর্তন বলতে ঠিক কি বোঝায়।

সাধারণভাবে বিবর্তন বলতে বোঝায় পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে বিদ্যামন প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি তথা উচ্চতর ট্যাক্সার উৎপত্তি। জীবজগতে বিবর্তনের মূলকথা এই যে, মানুষ সহ সকল জীবই ইতিপূর্বে বিদ্যমান জীবের উত্তরসূরী।

বিবর্তনের আধুনিক সংজ্ঞাটি নিম্নরূপঃ

> Evolution is a <u>change in the gene pool</u> of a population over time. A gene is a hereditary unit that can be passed on unaltered for many generations (The gene pool is the set of all genes in a species or population).

ডারউইনের আমলে বিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে কেবল প্রাকৃতিক নির্বাচনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। ডারউইনের মতে, জীবন সংগ্রামে যে সকল পরিবৃত্তি (variation) জীবকে সুবিধা করে দেয়, সেগুলো জীবকে টিকে থাকতে আর অধিক হারে বংশধর রেখে যেতে সাহায্য করে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, যে-পরিবৃত্তিগুলো অধিক অভিযোজনক্ষম, সেগুলোর বাহক জীবেরা বাড়তি সুবিধা পেয়ে উদ্বর্তিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এভাবে চলতে থাকলে একসময় ভ্যারাইটি থেকে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হয়। আজকের দিনের বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা অবশ্য প্রজাতির উৎপত্তির পেছনে **প্রাকৃতিক নির্বাচনের পাশাপাশি** বিবর্তনের জন্য অন্য যেসকল ফ্যাক্টরকে গন্য করেন সেগুলো হল :

- জিন মিউটেশন
- ক্রোমজম মিউটেশন
- জেনেটিক রিকম্বিনেশন
- জেনেটিক ড্রিফট
- এবং অন্তরণ বা আইসোলেশন

কাজেই দেখা যাচ্ছে ডারউইনের অবদানের পর থেকে বিজ্ঞানীরা কিন্তু বসে ছিলেন না, তারা বিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং বিবর্তনের নানা প্রক্রিয়া এবং ধাপকে সনাক্ত করেছেন। বিবর্তন একটি ধীর স্থির প্রক্রিয়া। বিবর্তনের সংশ্লেষণী তত্ত্ব মতে প্রজাতির উৎপত্তির মোদ্দা কথা হল স্থানীয় জনপুঞ্জ বা deme থেকে উপ-প্রজাতি, উপপ্রজাতি থেকে প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি তৈরী হতে মিলিয়ন বছরও লেগে যেতে পারে। অথচ রায়হান সাহেব চাচ্ছেন চোখের সামনেই কুকুর থেকে কেন ছাগল/ ভেড়া হয়ে যাচ্ছে না। রায়হান সাহেবকে কে বোঝাবে যে, তার চোখের সামনেই যদি কোন কুকুর ভেড়া হয়ে যেত তবে তা মোটেই বিবর্তন তত্ত্বকে নয়, বরং তার মহান স্রষ্টার ‘অলৌকিকত্ব’কেই সমর্থন করত।

জীববিজ্ঞানীদের আসলে কুকুর কেন ভেড়া হচ্ছে না, কিংবা ফিঞ্চগুলো কেন মানুষ হচ্ছে না এ নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। এগুলো জীববিজ্ঞানীদের কাছে অর্থহীন অবান্তর প্রশ্ন। তাদের কাছে আলাদা করে কুকুর বা ভেড়ার কোন মাহাত্ম্য নেই। তারা বরং দেখতে ইচ্ছুক ডারউইনীয় পদ্ধতিতে প্রকৃতিতে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটছে কিনা। তাদের কাছে প্রজাতি (**S**pecies), গোত্র (Family), বর্গ (Order), শ্রেনী (Class), পর্ব (Phyllum) প্রভৃতির সংজ্ঞা বরং বৈজ্ঞানিক। ফিঞ্চ পাখিগুলো কেন মানুষে পরিণত হচ্ছে না এটি তাই জীববিজ্ঞানের ভাষায় অবৈজ্ঞানিক প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করতে হলে প্রজাতি কি সেটি বৈজ্ঞানিকভাবে জানতে হবে।

বংশগতিবিদ্যা, বিবর্তনবিদ্যাসহ আধুনিক জীববিজ্ঞানের সকল শাখার কাছে গ্রহণযোগ্য প্রত্যয়টি প্রতিষ্ঠা করেছেন থিওডসিয়াস ডবঝানস্কি এবং আর্নেস্ট মায়ার প্রমুখ বিজ্ঞানী। তাঁদের মতে *প্রজাতি হচ্ছে কমন জিনপুল আছে এমন একটি মেন্ডলীয় জনপুঞ্জ*। আর্নেস্ট মায়ার **১৯৬৩** সালে সর্বসাধারণের জন্য প্রজাতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল :

> ‘প্রজাতি হল এমন একটি প্রাকৃতিক জনপুঞ্জ যার সদস্যগন বাস্তবে নিজেদের মধ্যে অবাধ জননরত অথবা জনন করার ক্ষমতা রাখে, যাদের একটি কমন জিন ভান্ডার (common gene pool) রয়েছে এবং অনুরূপ অন্যান্য দল থেকে **যৌনজননের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন**।’

অর্থাৎ একটি প্রজাতিকে হতে হবে অন্যান্য দল থেকে যৌন জননের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। সেরকম উদাহরণ কি আমরা পাইনি? চক্র প্রজাতি বা রিং স্পিশিজ গুলোই তো এর একেকটি বড় উদাহরণ। উত্তর ইউরোপের black-backed gulls এবং আমেরিকার Ensatina salamanders এর খুব ভাল উদাহরণ যারা একসময় একই উৎস থেকে উৎপত্তি হয়ে দুটি আলাদা প্রজাতিতে (যৌনজননের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন) পরিণত হয়েছে। (কিভাবে রিং স্পিশিজ গুলো বিবর্তনের ধারায় ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয় তা জানবার জন্য পাঠকেরা মার্ক রিডলীর ‘ইভ্যলুশন’ বইটি (পৃঃ ৫০-৫২; ৩৪৯-৩৫০) পড়তে পারেন)। বন্যা আহেমদ ও তার লেখায় Ensatina eschscholtzii group এর টিকটিকিদের কথা বলেছেন যে টিকটিকিগুলো একই উৎস থেকে উৎপত্তি হয়েও ভৌগলিক অন্তরণের কারণে ভিন্নভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং দেখা দেল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়াগোতে এসে যখন তারা আবার মিলিত হলো তখন ইতোমধ্যেই তারা দূটি ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়ে গেছে, কারণ তাদের মধ্যে আর প্রজনন সম্ভব হচ্ছে না। একই ঘটনা ঘটেছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের দু পাশের কাঠবিড়ালী গুলোর মধ্যে। একই উৎস থেকে উদ্ভব ঘটলেও তারা ভৌগলিক অন্তরণের কারণে দুটি ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে কালের পরিক্রমায়।

রায়হান সাহেব অবশ্য বলতে পারেন টিকটিকিগুলো তো শেষ পর্যন্ত টিকটিকিই, কিংবা কাঠবিড়ালীগুলো তো শেষ পর্যন্ত কাঠবিড়ালীই। ঠিক যেমন কুকুরের ক্ষেত্রে বুলডগ এবং অ্যালসেশিয়ান। এগুলো রায়হানের চোখে সম্ভবতঃ 'মাইনর ভ্যারিয়েশন'। কিন্তু টিকটিকি বা কাঠবিড়ালীগুলোর সাথে কুকুরের 'ভ্যারিয়েশনের' উদাহরণ একই পাল্লায় মাপলে ভুল হবে। কুকুরেরটা ভ্যারিয়েশন- এটি ঠিক আছে, কারণ বুলডগ এবং অ্যালসেশিয়ানের মধ্যে প্রজনন সম্ভব। তাই এটি ম্যাক্রো-বিবর্তনের উদাহরণ নয়। কিন্তু কুকুরের এই উদাহরণের সাথে উপরের উদাহরণগুলোর পার্থক্য এখানেই যে, সেই গাংচিল, টিকটিকি এবং কাঠবিড়ালীগুলো তাদের উৎসের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সাথে আর প্রজননে সক্ষম হচ্ছে না। তাই এগুলো তাই ম্যাক্রো-বিবর্তনের খুব ভাল উদাহরণ। দুই টিকটিকির গায়ে-গতরের মিল দেখে রায়হান সাহেবেরা হয়ত প্রতারিত হতে পারেন, কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা হন না। তারা প্রজাতিকে বিচার করেন তাদের কমন জিন ভান্ডার আর তাদের মধ্যে প্রজনন হয় কিনা তার নিরিখে। সে হিসেবে টিকটিকি গুলোর প্রজাতি অবশ্যই ভিন্ন। ঠিক একই কারণে সাধারণ মানুষেরা সাদা চোখে খেঁকশিয়াল আর নেকড়ের মধ্যে মিল পেতে পারেন, কিংবা সাদৃশ্য পেতে পারেন ওরাং ওটাং, শিম্পাঞ্জী বা গরিলার মধ্যেও, কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে আর প্রজনন সম্ভব হচ্ছে না, তাই তারা তৈরী করেছে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি।

রায়হান অবশ্য বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে প্রজাতির বাহ্যিক গঠণ পরিবর্তিত হয় কিনা এর চাক্ষুষ প্রমাণ আমাদের কাছে চাইতেই পারেন। কিন্তু যেহেতু আমরা উপরে বার বার করে বলেছি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এ ধরনের বিবর্তন ঘটতে কয়েক মিলিয়ন বছর লেগে যায়, তাই চোখের সামনে এরকম পরিবর্তন দেখার সম্ভাবনা বিরলই বটে। তারপরও বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। তারা প্রাণীদেহে ম্যাক্রো-বিবর্তনের জন্য দায়ী একটি জিন খুঁজে বের করেছেন যার নাম Ubx complex। এডোয়ার্ড লিউস এর জন্য ১৯৯৫ সালে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। এই Ubx জিন আসলে বহুল-খ্যাত Hox জিনের একটি।

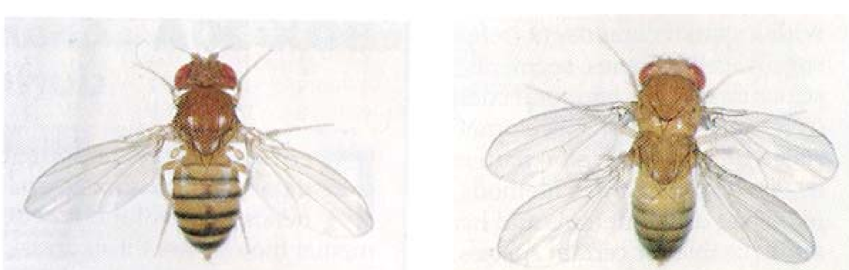

চিত্র : ল্যাবরেটরিতে ইউবি একস জিনের মধ্যে হোমিওটিক মিউটেশনের সার্থক প্রয়োগঃ দুই পাখা বিশিষ্ট Drosophila melanogaster ফ্লাই থেকে চার পাখা বিশিষ্ট ফ্লাইয়ের

উৎপত্তি। (Ref. Evolution and Development, Doglas J. Futuyama, Evolution, Sinauer Associates Inc. p.475)

এই জিনগুলোই আসলে প্রাণীদেহের কাঠামোর নিরব পরিকল্পনাকারী। এ জীনগুলোই বলে দিচ্ছে একটি মাছির কয়টি পাখা থাকবে আর মাকড়শার কয়টি পা থাকবে। এগুলো সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ফ্রুট-ফ্লাই-এ, পরে সেগুলো মাছ, ব্যাঙ কিংবা মানুষেও সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়। এগুলোর সামান্য অদলবদলেই বাহ্যিক গঠনে যে বিপুল পরিবর্তন করা সম্ভব তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিত। তারা ইতোমধ্যেই দুই-পাখা বিশিষ্ট ফ্রুট ফ্লাই এর বাহ্যিক গঠণ পরিবর্তন করে চার পাখা বিশিষ্ট ফ্রুট ফ্লাই-এ পরিণত করতে পেরেছেন, যে ধরণের প্রজাতি আর কোথাও নেই।

ইউবি একস কম্পলেক্স এবং হোক্স জিন সংক্রান্ত দুটি লিঙ্ক নীচে দেওয়া হল :

First Genetic Evidence Uncovered of How Major Changes in Body Shapes Occurred During Early Animal Evolution:
http://www.sciencedaily.com/releases/2002/02/020207075601.htm

Change of plan puts the Hox on creationists:
http://www.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=Hox

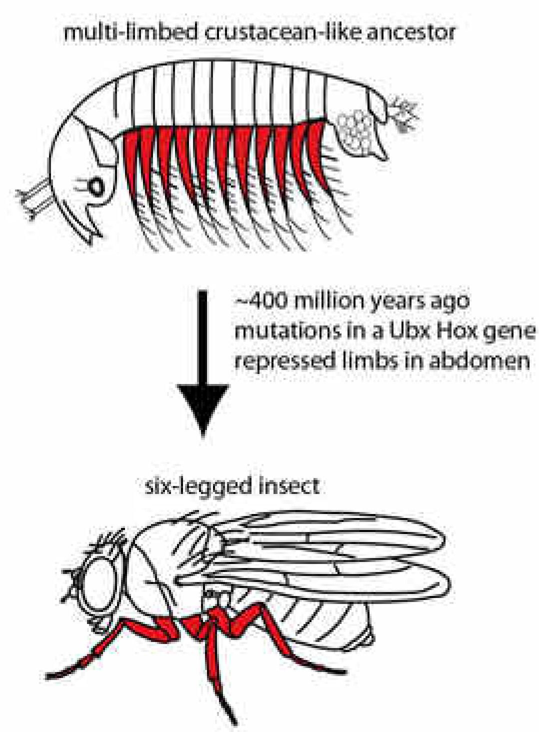

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ফ্রুট ফ্লাই এর পা এর সংখ্যা অদল বদল করে তাদের বাহ্যিক গঠণ বদলে দিতে পারেছেন। তারা আরও দেখেছেন ৪০০ মিলিয়ন বছর আগে যে প্রজাতিটি থেকে ছ' পা ওয়ালা ফ্রুট ফ্লাইগুলো ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে, তাদের দৈহিক কাঠমো একেবারেই ভিন্ন ছিল। তাদের পেটের নীচের দিকে শুরের মত অসংখ্য পা সদৃশ উপাংগ ছিল। হোক্স জিনগুলোর প্রভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে ছয় পায়ে এসে ঠেকে।

যা হোক, হোক্স জিন আর এধরণের জেনেটিক মেকানিজম সংক্রান্ত গবেষণা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমার ধারণা আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ম্যাক্রোবিবর্তনের সপক্ষে এমন সমস্ত প্রমাণ আমরা পেতে শুরু করব যে 'ম্যাক্রো-ইভলুশন স্রেফ বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে' - সৃষ্টিবাদীদের এ ধরনের হাস্যকর অভিযোগ 'ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি' আর 'নূহের মহাপ্লাবনের' গাঁজাখুরি গল্পের মতই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। তখন দেখা যাবে রায়হান শেষ পর্যন্ত কোন্ নৌকায় গিয়ে পা রাখেন।

তুচ্ছ দু' একটি ফসিল থেকে মহাকনক্লুশন?

জনাব রায়হান বিবর্তনবাদীদের 'অন্ধ মোল্লা' বানিয়ে দিয়ে বলেছেন : 'তুচ্ছ কিছু ফসিল (যেমন মিলিয়ন বছর আগের একটি দাঁত, সামান্য হাড়ের টুকরো ইত্যাদি) থেকে মহা কনক্লুশন ড্র করেছেন তা অন্ধ মোল্লাদেরও হার মানাবে'। এমন একটা ভাব যেন, বিবর্তনবাদীরা একটি হাড্ডি বা একটা দাঁত দিয়েই ম্যাক্রো-ইভলুশন হয়েছে তা প্রমাণ করতে চান। উনি কোন দুনিয়ায় আছেন কে জানে! যদিও ফসিল সংখ্যায় আনেক কম পাওয়া গেছে (এবং এটি প্রত্যাশিতই, কারণ পাললিক শিলা ছাড়া আর কোন শিলায় ফসিল তৈরী হতে পারে না, আর যাও বা পাললিক শিলার মধ্যে কোন ফসিল তৈরী হয়, অধিকাংশ সময়ই তা থেকে যায় মানুষের অগোচরে), তার পরও তা রায়হান কথিত দু-একটিও নয়, তুচ্ছও নয়। ঘোড়া, হাতী এবং উটের বিবর্তনের পুংখানুপুংখ ফসিল রেকর্ড পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয় পাওয়া গেছে 'মিসিং লিঙ্ক' বলে কথিত দুটি ফাইলা বা অন্যান্য ট্যাক্সার বৈশিষ্টসমৃদ্ধ মধ্যবর্তী বা ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল। যেমন সরিসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীবে উত্তোরণের সম্পূর্ণ ধাপগুলো খুব ভালভাবে ডকুমেন্টেড (দেখুন : Evoluion, Doglas J. Futuyma, pp 76)। Synapsids, Therapsida, Cynodonta থেকে শুরু করে আদি স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত সবগুলো ধাপের একাধিক ফসিল পাওয়া গেছে। এমনকি তাদের চোয়াল কিভাবে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়ছে সেগুলোও ফসিল থেকে উদ্ধার করা গেছে। ডঃ ফুতুয়ামা (যিনি মূলতঃ স্তন্যপায়ীদের বিবর্তনের উপরেই সারাজীবন গবেষণা করেছেন), তার বইয়ে বলেন,

‘The fossil record thus shows that most mammalian characters (e.g. posture, tooth differentiation, skull changes associated with jaw musculature secondary palate, reduction of elements that became middle ear bones) evolved gradually. Evolution was mosaic, with different characters advancing at different rates. **No new bones were evolved**: all the bones of mammals are modified from those of the stem group of “reptiles” (and in turn from those of amphibians and even lobe-finned fishes). Some major changes in the form of structures are associated with changes in their function. The most striking example is the articular and quadrate bones, which serves for jaw articulation in all other terapods, but became the sound-transmitting middle ear bones of mammals.’।

ঠিক তেমনি ভাবে সরীসৃপ থেকে কিভাবে পাখী বিবর্তিত হয়েছে তারও প্রায় সম্পূর্ণ ধাপগুলো পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আছে Eoraptor, Herrerasaurus, Ceratosaurus, Allosaurus, Compsognathus, Sinosauropteryx, Protarchaeopteryx, Caudipteryx, Velociraptor, Sinovenator, Beipiaosaurus, Sinornithosaurus, Microraptor, Archaeopteryx, Rahonavis, Confuciusornis, Sinornis, Patagopteryx, Hesperornis, Apsaravis, Ichthyornis, and Columba ইত্যাদির ফসিল। এর মধ্যে আর্কিওপটেরিক্সের (Archaeopteryx)ই পাওয়া গেছে গন্ডা খানেক ফসিল। যেমন ১৮৬১ সালে জার্মানীর ল্যাংগেনালথিমে (পরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত; The London Specimen), ১৮৭৭ সালে ব্লুমেনবার্গে (Berlin Specimen), ১৯৫৮ সালে ল্যাংগেনালথিমে(Maxburg Specimen), ১৮৫৫ সালে রিডিনবার্গে (Haarlem or Teyler Specimen), ১৯৫১ সালে ওয়ার্কারসজেলে (Eichstatt Specimen), ১৯৬০ সালে জার্মানীর ইৎসচাটে (Solnhofen Specimen), ১৯৯১ সালে ল্যাংগেনালথিমে (Munich Specimen), ২০০৫ এবং ২০০৬ এ জার্মানীতে আর্কিওপটেরিক্সের বিভিন্ন ফসিল উদ্ধার করা হয়েছে। চীনে (লিয়াওনিং) গত কয়েক বছরে এধনের ‘ডানা বিশিষ্ট ডায়নোসরের’ (Feathered Dinosaur) ফসিল পাওয়া গেছে প্রচুর। এর অনেকেগুলোই একেবারে সম্পূর্ণ ফসিল, রায়হান কথিত ‘দু-একটি হাডডি’ নয়। যেমন, নীচের আর্কিওপটেরিক্সের (বার্লিন স্পেসিমেন) কিংবা চীনে সম্প্রতি পাওয়া চার ডানা বিশিষ্ট মাইক্রোর‌্যাপটর গুইয়ের ফসিল দেখলেই বোঝা যায় যে এগুলোতে হাড় গোড়ের ছাঁচ থেকে শুরু করে পালক-বিশিষ্ট পাখা সবকিছুই এত স্পষ্ট যে এ থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় অজ্ঞ মানুষজনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন :

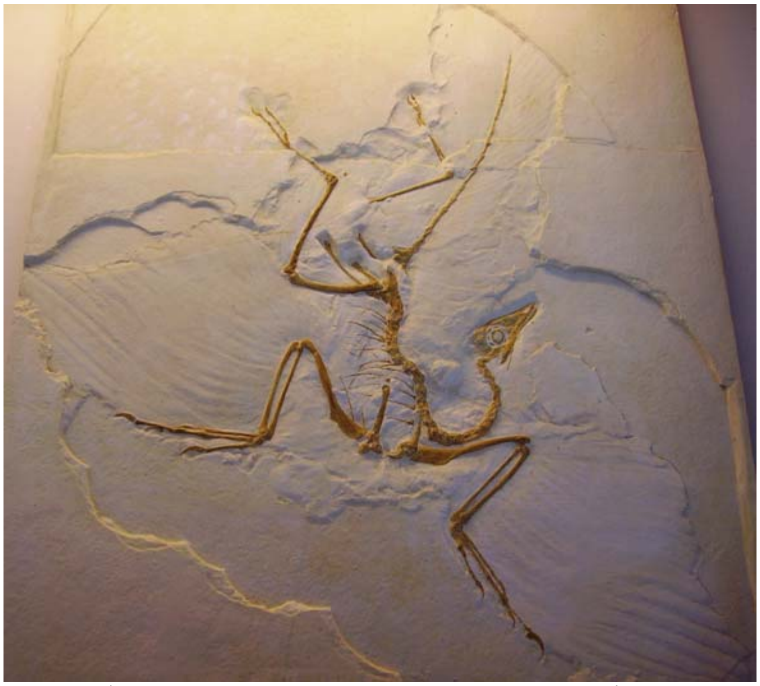

চিত্র : আর্কিওপটেরিক্সের (Archaeopteryx)র ফসিল (বার্লিন স্পেসিমেন)।

চিত্র : চীনে সম্প্রতি পাওয়া 'ডানা বিশিষ্ট ডায়নোসরের' (Feathered Dinosaur) ফসিল : মাইক্রোর‍্যাপটর গুই

নরবানর (ape) এবং মানুষের মধ্যবর্তী হারানো সূত্রের জীবাশ্মও কয়েক দশক আগে খুব ভালভাবেই পাওয়া গেছে। প্রখ্যাত জার্মান জীববিজ্ঞানী ও বিবর্তনবিদ আর্নেস্ট হেকেল (১৮৩৪-১৯১৯) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বই ‘সৃষ্টির ইতিহাস’ -এ মন্তব্য করেছিলেন যে মানব বিবর্তনের ধারা যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীর জীবাশ্ম বা ফসিল শিগগিরি পাওয়া যাবে। প্রাপ্ত ফসিল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আজ বলা যায় : Australopithecus এবং Homo -এর কয়েকটি প্রজাতিকে (যেমন, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo erectus) তো মানব বিবর্তনের হারানো সূত্র বলা যেতেই পারে। আমাদের জনপ্রিয় ফসিল ‘লুসি’ Australopithecus afarensis প্রজাতির অন্তর্গত। শ্রোণিচক্র ও উরুর হারের গঠন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, লুসি সোজা হয়ে দাঁড়তে আর দৌড়াতে পারত। কাজেই রায়হান নিশ্চয় এখন মানবেন যে যদি ঠিক জায়গার হাড়-গোড় ঠিকমত পাওয়া যায় তবে প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য ‘মহাকনক্লুশন ড্র’ করা এমন কোন ব্যাপার না। আর লুসির তো কেবল এই দু’ জায়গার হাড় নয়, সেই সাথে পাওয়া গেছে চোয়াল, উরু, হাত, বাহু, বক্ষপিঞ্জর সহ পুরো করোটি। লুসির জীবশ্মটি আবিষ্কার করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী ডোনাল্ড জোহানসন (Donald C. Johanson), ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ার হাডার থেকে। পরে এ ধরনের আরো অনেক ‘লুসির’ সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালে তাঞ্জানিয়ার লাটেও-লি তে এবং ১৯৯৫ সালে চাদের করোটো-রোতে। এমনকি লুসির চেয়েও পুরোন ‘বাইপেডাল মানুষের’ ফসিল পাওয়া গেছে ২০০৫ সালে (http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4322687.stm)। এদের সবাইকেই নরবানর আর মানুষের মধ্যবর্তী ‘হারানো যোগসূত্র’ হিসেবে ধরা হয় কারণ, এদের করোটির গঠন ছিল অনেকটা শিম্পাঞ্জীর মত (৪০০-৫০০ ঘন সি সি), কিন্তু তাদের দাঁতের গঠন ছিল আধুনিক মানুষের মত। আর তা ছাড়া এরা যে দু’পায়ের উপর ভর করে খাড়া হয়ে চলতে পারত তা তো আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া এদের শরীরের সাথে বাহুর অনুপাত মেপে দেখা গেছে (মানুষের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৭১.৮, শিম্পাঞ্জীর ক্ষেত্রে ৯৭.৮, আর লুসির ক্ষেত্রে ৮৪.৬) লুসির অবস্থান এ দু’প্রজাতির মাঝামাঝি। এরা পৃথিবীতে ছিল ৩ থেকে ৪ মিলিয়ন বছর আগে।

মানুষের অন্য প্রজাতিরও ফসিল পাওয়া গেছে অনেক। যেমন, নিয়ান্ডার্থাল আর ক্রো-ম্যাগনন। ১৮৬৬ আলে ফুলরট (Fuhlrott) যখন প্রথম নিয়ান্ডর্থাল মানুষের ফসিল খুঁজে পেলেন ডুসেলডর্ফ শহরের কাছে চুনের এক খনি থেকে, অনেকেই তা যে মানুষের জীবাশ্ম - তা মানতে রাজী ছিলেন না। যেমন ডঃ ওয়াগনার বলেছিলেন, এটি কোন জীবাশ্ম নয়, বরং এক বৃদ্ধ ওলন্দাজের করোটি। বন নগরের ডঃ মেয়র বলেছিলেন এটি নেপোলিয়নের পেছনে ধাওয়া করা এক কসাক সৈন্যের করোটি। প্রনার-বে বলেছিলেন এটি সেল্টদের একটি খুলি। এমনকি রুডল্ফ ফিরকোর (Rudolf Virchow) মত নামজাদা বিজ্ঞানী মনে

করেছিলেন এটি কোন রিকেট রোগাক্রান্ত কোন লোকের বিকৃত মাথার খুলি হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে সেটি মানুষেরই একটি অন্য প্রজাতি, এবং এর নামকরণ করা হয় : Homo sapiens neanderthalen-sis। পরে তো নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আরো ফসিল পাওয়া গেছে ফ্রান্সের লি মোস্টিয়া, লা ফেড়াসি, লা কুইনা, জিব্রাল্টারে; ইতালির মন্তে সিরসিয়ো ও সাগোপেস্তারে; ইরাকের শানিদারে, ইউক্রেনের কিইক-কোবাতে, ক্রোয়েশিয়ার ক্রাপিনাতে, জার্মানীর এহরেনডার্ফে, ইসরাইলের তাবুন, আমুদ এবং কেবারা-তে। এছাড়া ইউরোপ এবং এশিয়ার বাইরে আরো অনেক স্থানেই এদের ফসিল পাওয়া গেছে। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন সময় পাওয়া গেছে জাভা মানুষ, পিকিং মানুষ, রামা-পিথেকাস, টাউং শিশু (Australopithecus africanus), ওমানো মানুষ, ন্গালোবা মানুষ, জেবেল কাফজেহ, ভেরটেচ্জলেশ্চাস মানুষ, পেট্রালোনা মানুষ, টাউটাভেল মানুষ, সোয়ানকম্ব মানুষ, স্টেইনহেম মানুষ সহ অসংখ্য ফসিল।

কোন প্রজাতির কয়টি ফসিল পাওয়া গেল এটি আজ কোন প্রশ্ন নয়, মুল প্রশ্ন হল **একটি ফসিলও কি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে যা বিবর্তনের ধারাকে লংঘন করে? এর সোজা সাপ্টা উত্তর - না এখন পর্যন্ত একটিও তেমন ফসিল পাওয়া যায় নি।** একবার বিজ্ঞানী জেবি এস হালডেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিভাবে বিবর্তনকে ভুল প্রমাণ করা যায়? উত্তরে হালডেন বলেছিলেন, কেউ যদি প্রক্যাম্বরিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পায় :

> "I will give up my belief in evolution if someone finds a fossil rabbit in the Precambrian."

বলা বাহুল্য এ ধরনের কোন ফসিলই এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয় নি। না হওয়ারই কথা, কারণ বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের যে ধারাটি আমাদের দিয়েছেন তা হল :

> মাছ –> উভচর –> সরীসৃপ –> স্তন্যপায়ী প্রাণী

খরগোশ যেহেতু একটি পুরোপুরি স্তন্যপায়ী প্রাণী, সেহেতু সেটি বিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন ধাপে (মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরিসৃপ এবং সরিসৃপ থেকে শেষ পর্যন্ত খরগোশ), তাই এতে সময় লেগেছে বিস্তর। প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল পাওয়ার কথা নয়, কারণ বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী এ সময় (প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগে) থাকার কথা কতকগুলো আদিম সরম প্রাণ - যেমন নিলাভ সবুজ শৈবাল, সায়নোব্যকটেরিয়া ইত্যাদি (ফসিল রেকর্ডও তাই বলছে)। আর স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছেট্রায়োসিক যুগে (প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগ শেষ হওয়ার ৩০ কোটি বছর পরে)। কাজেই কেউ সেই প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পেলে তা সাথে সাথেই বিবর্তনতত্ত্বকে নস্যাৎ করার জন্য যথেষ্ট হত। রায়হান সাহেবের মত সৃষ্টিবাদীদের জন্য দুর্ভাগ্য এখনও তেমন কোন ফসিল পাওয়া যায়নি।

শুধু খরগোশ নয়, বিবর্তনের ধারাটি সকল জীবের জন্যই একইভাবে প্রযোজ্য। যেমন বিবর্তন তাত্ত্বিকদের মতে বিবর্তনের ধারায় মানুষ যেহেতু এসেছে অনেক পরে (সিনোযোয়িক যুগের আগে নয়), তাই তার আগে, যেমন ডায়নোসরের ফসিলের সাথে একই বয়সী কোন মানুষের ফসিল পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। সবচেয়ে পুরোনো খাড়া হয়ে হাটা মানুষের ফসিল ইথিওপিয়ায় পাওয়া গেছে যা ৪০ লক্ষ বছরের পুরোনো। আর ডায়নোসারেরা প্রবল প্রতাপে এ পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে সেই জুরাসিক যুগে (১৪ কোটি থেকে ২০ কোটি বছর আগে)। ডায়নোসরের বিলুপ্তি ঘটে ক্রেটাসিয়াস যুগে (এখন থেকে সাড়ে ছ কোটি বছর আগে)। সৃষ্টিবাদীরা মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি করে ডায়নোসারের আমলে 'মানুষের ফসিল' পাওয়ার চেষ্টা করলেও সেগুলো একটিও ধোপে টিকেনি। তাই প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স বলেছেন :

> "And far telling - not a single authentic fossil has ever been found in the "wrong" place in the evolutionary sequence. Such an anachronistic fossil, if one were ever unearthed, would blow evolution out of the water."

শুধু তো ফসিল নয়, জীববিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, আনবিক জীববিদ্যার কোন শাখাই বিবর্তনের কোন সাক্ষ্যের বিরোধিতা তো করছেই না, বরং যত দিন যাচ্ছে বিবর্তনের ধারাটি সবার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে; বিবর্তনতত্ত্ব দিন দিন হয়ে উঠছে এক কথায় অপ্রতিরোধ্য। কাজেই আমি আশা করব রায়হান বিবর্তনবাদীদের 'অন্ধ মোল্লা' বলবার আগে ভবিষ্যতে দু' বার চিন্তা করবেন।

বিবর্তনের নামে জালিয়াতী

রায়হান বিবর্তনবাদীরা যে জালিয়াত প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন : 'মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের পুরাতন একটি মাত্র দাঁত থেকে আস্ত মানুষের ছবি ড্র করা হচ্ছে। পরে আবার অন্যান্য বিজ্ঞানীরা রিসার্চ করে দেখিয়েছেন যে এটি আসলে একটি শুকরের দাঁত ছিল! এরকম আরো মজার কাহিনী আছে।' শুধু তাই নয়, রায়হান পাঠকদের জন্য দুটি 'চমৎকার এবং ইনফরমেটিভ' ভিডিও ক্লিপ দিয়েছেন, যার ফলে (তার ভাষায়) 'পাঠকেরা অলটারনেটিভ তথ্য পেয়ে যাবেন' এবং 'যেগুলো তাদের নতুন করে চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে।'

আমি দুঃখিত যে রায়হানের ‘চমৎকার এবং ইনফরমেটিভ’ ক্লিপ দুটি কাজ করছে না; ফলে আমি তা দেখতে পারি নি। তবে অনুমান করতে পারি ক্রিয়েশনিসটদের ‘চটকদার’ ইনফরমেশন কেমন হতে পারে। তবে আনুমানের উপর ভিত্তি করে ঢালাও কোন মন্তব্য করা উচিৎ নয়, ফলে সেটি থেকে এই মুহূর্তে বিরত থাকলাম। তবে রায়হান সহ অন্যান্য সৃষ্টিবাদীরা ‘বিবর্তনের জালিয়াতীর’ যে সমস্ত অভিযোগ ঢালাওভাবে উত্থাপন করেন তার একটা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

রায়হান সাহেব অতি ঝাপসা ভাবে শুয়োরের দাঁত সংক্রান্ত যে গল্পটি শুনিয়েছেন তার নাম ‘নেব্রাস্কা ম্যান’। ক্রিয়েশনিস্টদের ‘গুরু’ দুয়েন গিশ তার ‘Evolution: The Challenge of the Fossil Record’ বইয়ে গল্পটি যে ভাবে এটি উল্লেখ করেছেন তা হল :

> ‘Nebraska Man (*Hesperopithecus haroldcookii*) was described on the basis of a single tooth that turned out to come from a peccary. This tooth was used to construct an entire species, complete with illustrations of the primitive man and his family.’

এর জবাব বিবর্তনবাদীরা অনেক আগেই দিয়েছেন। প্রথমতঃ *নেব্রাস্কা ম্যান* এর এই গল্প কোন সায়েন্টিফিক জার্নালে ছাপা হয়নি। দাঁতের উপর ভিত্তি করে যে ছবিটি ১৯২২ সালে অখ্যাত এক আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকা হয়েছিল তা এক ‘পপুলার ম্যাগাজিন’ এর জন্য, কোন বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য নয়। দু একজন ছাড়া অধিকাংশ বিজ্ঞানী সবসময়ই এই ব্যাপারটির প্রতি সন্দিহান ছিলেন। যেমন, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নাল Sceince এ সেসময় (১৯২৭ সালে) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেখা হয়[†] :

> ‘The scientific world, however, was far from accepting without further evidence the validity of Professor Osborn's conclusion that the fossil tooth from Nebraska represented either a human or an anthropoid tooth.’

এমনকি সে সময় প্রকাশিত ‘*Human Origins* ’ বইটিতেও নেব্রেস্কা মানুষকে স্থান দেওয়া হয় নি। বরং বলা হয়েছিলো :‘The teeth are not well preserved, so that the validity of Osborn's determination has not yet been generally accepted’।

[†] Gregory W.K. (1927): Hesperopithecus apparently not an ape nor a man. Science, 66:579-81. (identified the Nebraska Man tooth as belonging to a peccary)

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরাই *ওসবনের* দাবীকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন, এবং তারাই শেষ পর্যন্ত এর প্রকৃত সত্যতা উদঘাটনে সমর্থ হন এবং নেব্রেস্কো ম্যানকে বাতিল করে দেন; এখানে ক্রিয়েশনিস্ট বা সৃষ্টিবাদীদের কোন কৃতিত্ব নেই। কাজেই নেব্রেস্কো ম্যান এর এই কাহিনীটি বিজ্ঞান তথা বিবর্তনবাদীদের জন্য লজ্জা নয়, বরং অগ্রযাত্রাই প্রকাশ করছে। এখানে আরেকবার প্রকাশিত হল বিজ্ঞান আসলে সংশয়বাদী। এখানে কোন তথাকথিত 'মহানবী' ওহী নাজিল করলেই তা 'সাদরে গৃহীত' হয়ে যায় না। বরং পরীক্ষা নিরীক্ষায়ত উত্তীর্ণ হলেই তা কেবল বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকদের পাওয়া এমনো অনেক ফসিল আছে যেগুলোকে বিজ্ঞান এখনো গ্রহণ করছে না কারণ বিজ্ঞানের চোখে ওগুলো সন্দেহমুক্ত নয়। যে 'অন্ধ মোল্লা'দের সাথে রায়হান সাহেব বিবর্তনবাদীদের তুলনা করেছেন, তাদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে এরকম নিবিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব? সম্ভব কখনও তথাকথিত ঈশ্বরের লেখা কোন পবিত্র আয়াতকে ভুল বলে ঘোষনা করা কিংবা 'বাতিল' করে দেওয়া, তা যতই পরষ্পরবিরোধী বা অবৈজ্ঞানিক শোনাক না কেন?

অনেক কিছু নিয়েই ক্রিয়েশনিস্টরা অযথা নরক গুলজার করেন। যেমন, পিল্টডাউন ম্যানের ভাঁওতা, আর্নেস্ট হ্যাকেলের ভ্রুনের ছবি, আর্কিওর্যাপটরের ফসিল ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রে গবেষণারত বিজ্ঞানীরাই রহস্যের মুলোদ্ঘাটন করেছেন; সন্দেহজনক বিষয়টি নিয়ে বছরের পর বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, বার বার বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সত্যতা মিলিয়ে দেখেছেন (checking and counter checking)। তারপর সন্দেহমুক্ত হলেই কেবল গ্রহণ করেছেন, নয়ত বাতিলের খাতায় তুলে রেখেছেন। বিজ্ঞান এভাবেই এগোয়; পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তবেই সিধান্ত নেয়। অথচ সৃষ্টি তাত্ত্বিকরা বিজ্ঞানের পদ্ধতি না জেনে বা বুঝেই অনর্থক লাফালাফি-ঝাপাঝাপি করতে থাকেন। কোথাও কোন ফাঁক ফোকর পেলেই পুরো 'বিবর্তনবাদ' বিষয়টিকেই ডাস্টবিনে ফেলে দিতে উদ্যত হন।

তারপরও ভাঁওতাবাজী করার চেষ্টা যে হয় না তা নয়। অনেকে মিথ্যা নাম কামানোর জন্য ভাঁওতা দিতে চেষ্টা করেন, অনেকে আবার পয়সা, খ্যাতি যশের লোভে করেন। কিন্তু সে তো কেবল বিবর্তনবিদ্যায় নয়, বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ওরকম দু-একটি নমুনা পাওয়া যাবে। এই তো সে দিনও বিখ্যাত বেল ল্যাব এবং লুসেনটের নামে 'বৈজ্ঞানিক ডেটা ফেব্রিকেশনের' আভিযোগ উঠেছে, অভিযোগ উঠেছে এমনকি 'মিথ্যা পেটেন্ট' তৈরীরও। এখন কি রায়হান সাহেব বলবেন বিজ্ঞানীরা এতদিন ধরে অর্ধ-পরিবাহীর (semiconductor) উপর যা যা গবেষণা করেছেন তা সব মিথ্যা? গণিতেও তো এ ধরনের উদাহরণ আছে। বিজ্ঞানীরা যখন 'ফার্মিস লাস্ট থিওরামের' কোন প্রমান পাচ্ছিলেন না, এবং এর জন্য অর্থ পর্যন্ত বরাদ্দ করেছিলেন, তখন দু' একজন 'ভুয়া গনিতবিদ'

গাঁজাখুরি দিয়ে এটি মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে। তা বলে কি পুরো গনিতশাস্ত্রই এখন মিথ্যা হয়ে গেছে? আতি নির্বোধরাই এ ধরণের দাবী করবে। তারপরও রায়হান সাহেব 'শুকরের দাঁতের' গল্প শুনিয়ে পুরো বিবর্তনতত্ত্বকেই নস্যাৎ করতে চান, যেন বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিকদের এত দিনকার শ্রম আর নিষ্ঠা সব মিথ্যা। রায়হানের চোখে বোধ হয় সব বিজ্ঞানীরাই হয় 'অন্ধ মোল্লা' নয়ত 'ভাঁওতাবাজ'!

ভাঁওতার কথা যদি বলতেই হয়, তবে ক্রিয়েশনিস্ট বা সৃষ্টিবাদীদের বিখ্যাত ভাঁওতাগুলো সম্বন্ধেও তো বলা উচিৎ। বিবর্তনবাদীদের একটি দু'টি ভাঁওতার গল্প যদি পাওয়া যায়, ক্রিয়েশনিস্টদের ক্ষেত্রে তা পাওয়া যবে গন্ডা গন্ডা। যেমন, উল্লেখ করা যেতেই পারে 'প্যালক্সি পদচিহ্ন' (Paluxy footprints), 'ক্যালাভেরাস খুলি' (Calaveras skull), 'মোয়াব' (Moab) এবং 'ম্যালাচিট মানব' (Malachite Man) -এর ধাপ্পাবাজিগুলো। কখনও ক্রিয়েশনিস্টরা পৃথিবী 'ছ হাজার বছরের বেশী পুরনো নয়' এই বাইবেলীয় মিথটি প্রমাণ করতে ডায়নোসারের পায়ের ছাপের সাথে মানুষের পায়ের ছাপ জুড়ে দিয়েছে; কখনও বা আধুনিক মানুষের ফসিলকে 'জুরাসিক পিরিয়ডের' বলে দাবী করা হয়েছে। এগুলো কি রায়হান সাহেবের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে? বিবর্তনবাদীদের ঘায়েল করার জন্য উগ্র ধর্মবাদীদের ওয়েব-সাইটে অতিরিক্ত ঘোরাঘুরি করলে দৃষ্টি এড়িয়ে যাবারই কথা। নাকি এর পেছনে মূল কারণ রায়হানের 'উদ্দেশ্যমূলক নির্লিপ্ততা' কিংবা 'ছদ্ম-নিরপেক্ষতা'? রায়হান বলেছেন, 'আমার উদ্দেশ্য ইভোলুশনের বিরোধিতা করা নয়, বরং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে অল্টারনেটিভ কিছু তথ্য তুলে ধরা যেগুলো মানুষ হাইড করতে চায়।' হুমম্। 'ইভলুশনের বিরোধিতা করা নয়' - এজন্যই রসিয়ে রসিয়ে পাঠকদের কেবল শুয়োরের দাঁতের গল্প শোনানো হয়েছে! আর 'যেগুলো মানুষ হাইড করতে চায়' সেগুলো প্রকাশ করার মহতী উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই বুঝি সৃষ্টিবাদীদের ধাপ্পাবাজিগুলো চেপে যাওয়া হয়েছে? সাধু সাধু!

শেষ কটি কথা

বিবর্তন নিয়ে সবচেয়ে হাস্যকর যে কথাটি রায়হান বলেছেন তা হল ফসিল পাওয়ামাত্রই নাকি বিবর্তনবাদীরা চিৎকার করে উঠছে - 'God does not exist'। রায়হান সাহেবকে কি করে বোঝাই যে, গড আছে কি নেই তা নিয়ে বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের কোন মাথা ব্যথা নেই। বিজ্ঞানীরা ফসিলের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন কারণ তারা প্রাণের উদ্ভব আর বিকাশের ধারাটিকে তারা খুব ভাল ভাবে বুঝতে চান; এবং তা কোন অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক উপায়ে নয়, বরং জানতে বুঝতে চান বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই। আর এই জানা বোঝার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য এসেছে ফসিল বা জীবাশ্ম থেকে। শুধু তাই নয়, অংগসংস্থানবিদ্যা,

শ্রেনিবিন্যাসবিদ্যা, প্রাইমেটবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা, বংশগতিবিদ্যা, আনবিক জীববিদ্যা সব শাখাতেই এখন ফসিলের গুরুত্ব অপরিসীম।

রায়হান সাহেব হঠাৎ করে বিবর্তনের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন কেন? সম্ভবতঃ মুক্ত-মনায় 'বিবর্তনের ঠ্যালা' খেয়ে ইদানিংকার 'কোরান-ওনলি' বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা হয় - পড়ি মরি করে ধর্মবাদীদের ওয়েব সাইট থেকে নানা পদের 'তথ্য' সংগ্রহ করে একটা 'রিবিউটাল' লিখে ফেললেন। কিন্তু উনি বোধ হয় ভাবেননি এর ফল কত মারাত্মক হতে পারে। আজকের দিনে বিবর্তনের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ এতোই বেশী যে চটকদার কিছু জবরজং তথ্য উগরে দিয়ে বোধ হয় পার পাওয়া যাবে না।

প্রতিটি যুগেই সৃষ্টিবাদীরা বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রাকে ঠেকানোর নানাভাবে চেষ্টা করে এসেছে। বিশেষতঃ যখনই ধর্মগ্রন্থের সাথে বিরোধ দেখেছে বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছে আস্তাকুড়ে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। বাইবেল-বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য গ্যালিলিও, ব্রুনোর মত বিজ্ঞানীকে করেছে নির্যাতন। তারপরও ঈশ্বর ও তার পুত্ররা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা থামাতে পারেননি। একটা সময় সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ এতোই প্রবল হয়ে দাঁড়ালো যে, ধর্মবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সবাই এটি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ জন্যই পদার্থবিজ্ঞানী ভিকটর স্টেংগর তার 'Has Science found God?' বইয়ে বলেন :

> 'এক শতাব্দীর মধ্যেই কোপারনিকাসের সৌর-তত্ত্বের বিরুদ্ধে ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের সংগ্রাম ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। মূলতঃ কোপারনিকাসের তত্ত্বের পক্ষে জোড়ালো সাক্ষী প্রমাণগুলো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো যে, ধর্মকে হয় একসময় বাস্তব সত্য গ্রহণ করে নিতে হত না হয় ধ্বংস হয়ে যেতে হত। শেষ পর্যন্ত বলতে গেলে, একধরনের প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্য দিয়েই ধর্মকে মেনে নিতে হয় যে পৃথিবী আসলেই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এর ফলে গোড়া ধার্মিকেরাও এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় যে বাইবেলে লেখা সব কিছুকে সবসময় আক্ষরিক অর্থে মেনে নেওয়া যাবে না। এখান থেকেই ধর্মবাদী(Apologistic)দের পক্ষ থেকে নতুন জ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে বাইবেলকে পুনর্ব্যখ্যার প্রয়াস শুরু হয়, তা বাইবেল-বিবৃত আক্ষরিক বাণীর সাথে সাদা চোখে যতই অসঙ্গতিপুর্ণ মনে হোক না কেন।'

খ্রীষ্টান ধর্মবাদীরা যেমন 'আধুনিক জ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে বাইবেলকে পুনর্ব্যাখ্যা' করার প্রয়াস নিয়েছে, তেমনি রায়হান, জামিলুল বাসার, হারুন ইয়াহিয়া, শমসের আলীর মত লোকজন নিয়েছে কোরানকে পুনর্ব্যাখ্যার প্রয়াস। আজ তাই জামিলুল বাসারেরা অনড় ও স্থির পৃথিবীকে (দেখুনঃ Q.15:19) অস্বীকার করেন, কিংবা জুলকার্নাইনের 'পঙ্কিল জলাশয়ে' সূর্যকে ডুবতে দেখার বর্ণনাটিকে (Q. 18:86) রূপক বানিয়ে দেন। কেউ কেউ আবার আরো আগ বাড়িয়ে কোরানে বিগ-ব্যাং পর্যন্ত আবিস্কার করে বসেন। বাইবেল-ওয়ালারাও যে বসে

ছিলেন, তা নয়। এদের মধ্যে মাঝখানে আবার একদল ‘ইয়ং আর্থ ক্রিয়েশনিস্ট’দের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা বাইবেলীয় ধারণায় বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর বয়স মাত্র ছ’হাজার বছর। সময়ের সাথে সাথে তাদেরও বিলুপ্তি ঘটল যখন রেডিও অ্যাকটিভ ডেটিং এর মাধ্যমে জীবাশ্মের সঠিক বয়স নির্ণয় করা গেল, এবং মিলিয়ন বছর আগেকার ফসিল আবিস্কৃত হতে লাগলো। শুধু তো বৈজ্ঞানিক মহলেই নয়, রাজনৈতিক মঞ্চেও সৃষ্টিতত্ত্ব পিছু হটে গিয়েছিলো যখন আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে এই ধরনের ঐশ্বরিক সৃষ্টিতত্ত্বকে ‘বৈজ্ঞানিক নয়’ বরং ‘রিলিজিয়াস ডগমা’ হিসেবে চিহ্নিত করে দিলেন। ধর্মগ্রন্থকে সাক্ষী গোপাল করে আর বিবর্তনকে ঠেকানো যাচ্ছে না দেখে এখন আবার বাজারে এসেছে ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন’। এই দলের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের মহাবিশ্বের সবকিছু এত সূক্ষভাবে সমন্বিত যে, এটি দেখলে মনেই হবে এটি ‘ইন্টেলিজেন্টলি ডিজাইনড্’ বা বিদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টি। আইডি ওয়ালারা তাদের এই ‘তত্ত্ব’ ধর্মের সাথে সম্পর্কবিহীন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে জাহির করতে চাইলেও, দুর্মুখেরা বলেন এটি আসলে পুরোন সৃষ্টিতত্ত্বকেই বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করার এক সুচতুর প্রয়াস। ভাসুরের নাম মুখে না নিতে চাইলেও তাদের কথিত ‘ইনটেলিজেন্ট ডিজাইনার’ প্রকারন্তরে ওই ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত পরাক্রমশালী ঈশ্বরই।

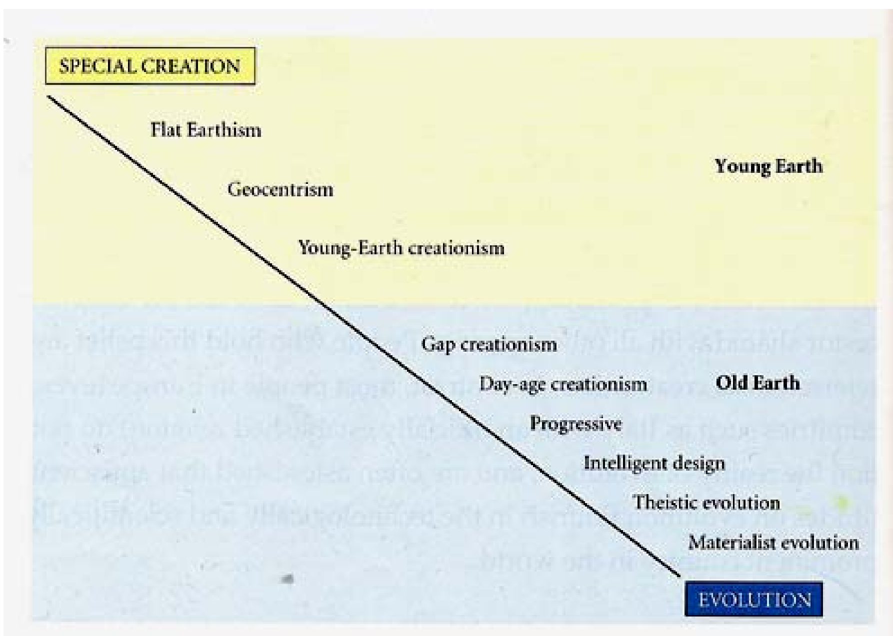

চিত্র : ক্রিয়েসনিস্টদের বিবর্তনের রূপরেখা (Ref. Evolutionary science, creationism and society, Doglas J. Futuyama, Evolution, Sinauer Associates Inc. p525)

আইডি ওয়ালাদের চেয়ে আরেকটু প্রগতিশীল অবস্থানে আছেন ‘বিশ্বাসী বিবর্তনবাদী’ (theistic evolutionist) দের দল। তাঁরা মনে করেন ঈশ্বর এক সময় পৃথিবীতে প্রাণের

উন্মেষ ঘটালেও পরবর্তীতে আর এতে হস্তক্ষেপ করেননি, বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণকে বিকশিত হতে দিয়েছেন। প্রয়াত পোপ জন পল ২ এ ধরনের বিশ্বাসী বিবর্তনবাদী ছিলেন যিনি বিবর্তনকে বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী ডগলাস ফুতুয়ামা ‘ক্রিয়েশনিস্টদের বিবর্তনের’ একটি ধারাবাহিক ছবি তার ‘ইভলুশন’ বইতে উল্লেখ করেছেন (ওপরের ছবি)।

বিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেংগর এ প্রসঙ্গে লেখেন :

> ‘The species of religious thought called creationism continues to evolve by a process of natural selection. While, as National Center for Science Education executive director Eugenie Scott has pointed out, there has always been a continuum of creationist views from extreme to moderate, we can still identify a few dominant strains.’

আমরা মনে করি এ সমস্ত ‘বিশ্বাসী বিবর্তনবাদী’রাই ‘বিজ্ঞানের ঠ্যালা’ খেয়ে ধীরে ধীরে একটা সময় জৈব বিবর্তনকে একটি বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, এবং শেষ মেষ বুঝবেন জড়জগৎ এবং জীবজগতের সবকিছুই প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন আর বিকশিত হয়েছে এবং এ সবই ঘটেছে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায়। যে ভাবে তারা একদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মগ্রন্থগুলোতে যাই লেখা থাকুক না কেন, সূর্য কখনই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না; ঠিক তেমনিভাবে একদিন শিখবেন আদম-হাওয়ার কেচ্ছা-কাহিনীগুলো থেকে মুখ সরিয়ে বিবর্তনবাদের উপর আস্থা রাখতে। জেনেটিক্স এবং আনবিক জীববিদ্যার মত নতুন শাখাগুলো যেভাবে বিবর্তনের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে শুরু করেছে, এটি এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপারমাত্র।

====================

২৭ আগাষ্ট, ২০০৬

অভিজিৎ রায়, ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com